কওমি শিক্ষাব্যবস্থার কেবলা কোন দিকে?

পারভেজ আলম

বাংলাদেশে কওমি শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে গত কয়েক শতকে তার বিকাশধারা, বিভিন্ন পর্বে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পর্ক, রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতির সাথে সাথে এর পরিবর্তন ধরন পাঠ জরুরী। বর্তমান প্রবন্ধে এই ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কওমি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

আল গাজালি তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর পূর্বে (১১১০ খ্রি.) বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন সেলজুক সালতানাতের উজির মুহাম্মদ ইবনে ফখর আল মুলক। মুহাম্মদের দাদা ছিলেন বিখ্যাত উজির নিজাম আল মুলক, যিনি সেলজুক সালতানাতের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা পদ্ধতি নিজামিয়া মাদ্রাসা বলে পরিচিত ছিল, আর বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল এসব মাদ্রাসার মধ্যে প্রধান। আজ অবধি মুসলিম দুনিয়ায় যে মাদ্রাসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার সূত্রপাত মূলত এই নিজামিয়া মাদ্রাসা পদ্ধতির মাধ্যমেই। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো হয় 'দারস-এ-নিজামি' অথবা তার পরিবর্তিত পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকে। আল গাজালি যুবক বয়সে বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এগারো শতকের মুসলিম দুনিয়ার রাজনৈতিক ডামাডোল ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক চাহিদার কারণে তিনি শিক্ষকতার জীবন ত্যাগ করে ভ্রাম্যমাণ দরবেশের জীবন বেছে নেন। তাঁর এই মানসিক পরিবর্তনের পেছনে উগ্রবাদী ধর্মীয় সংগঠন হাসিসিনদের (যাদের নাম থেকে আধুনিক অ্যাসাসিন শব্দটি এসেছে) হাতে নিজাম আল মুলকের হত্যাকাণ্ডও ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীতে নিজাম আল মুলকের পুত্র ফখর আল মুলক উজির থাকাকালীন তাঁর ক্রমাগত অনুরোধের ফলে গাজালি অল্প কিছুদিন নিশাপুরের নিজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ফখর আল মুলকের অনুরোধ তিনি ফিরিয়ে দিলেন।[১]

দায়িত্ব গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে মুহাম্মদের উদ্দেশে গাজালি একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা সামনে কিছুটা আলাপ করব। তবে আপাতত এইটুকু বলে রাখা দরকার যে নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠান। আজকাল বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের একটা বড় অংশকে সংস্কারের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে বড় ধরনের আপত্তি করতে দেখা যায়। তাদের আশঙ্কা সরকার নিয়ন্ত্রিত হলে এবং কর্ম ও উৎপাদনমুখী সংস্কারের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি এলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ফিতনা সৃষ্টি হবে, তাদের ইমান ও আমল নষ্ট হবে। কওমি মাদ্রাসার এই অবস্থানের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের যেসব বুদ্ধিজীবী লেখালেখি করেন, তাঁরাও কাছাকাছি বক্তব্য দেন। তাঁরা বলতে চান যে শিক্ষার দর্শন বিষয়ে প্রশ্ন না তুলে কওমি মাদ্রাসা পদ্ধতির ঢালাও সমালোচনা করা উচিত হবে না। তাঁদের দাবি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কর্ম ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা দেয়া কওমি মাদ্রাসার দর্শন নয়। তাঁদের দাবি শুনলে মনে হয় কওমি মাদ্রাসা তো বটেই, গোটা মাদ্রাসা ব্যবস্থারই বুঝি কোনো ইতিহাস নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা যেন আকাশ থেকে নাজিল হয়েছে। যেন বা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিবর্তন দুনিয়াবি ক্ষমতা-কাঠামো ও সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু প্রথম সুসংগঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি যেমন 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' এবং এর পূর্বে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলোর ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায় যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সরকারি কর্মচারী তৈরি করা; রাজ্য শাসন ও পরিচালনার জন্য দরকারি শ্রমশক্তি তৈরি করা। মাদ্রাসাগুলো ছিল মূলত শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক হাতিয়ার, সরকারের দরকারমতো আইনি ও প্রাশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন মেটাতেই মাদ্রাসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যেমন নিজাম আল মুলক নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসমাইলিয়াসহ বিভিন্ন ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে সেলজুক সরকারের পক্ষে মতাদর্শিক ও আইনগত সমর্থন শক্ত করার জন্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ ও মনস্টারিকেন্দ্রিক যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল তার সাথে মাদ্রাসার এটা ছিল গুণগত পার্থক্য। কিন্তু বারো শতকের পর দেখা গেল ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মাদ্রাসার মতোই 'প্রফেশনাল' তৈরির উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠা শুরু করেছে। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই নাম দেয়া হয়েছিল ইউনিভার্সিটি, বাংলায় আমরা যাকে বলি বিশ্ববিদ্যালয়। মোটকথা প্রাক-আধুনিক যুগে ভূমধ্যসাগরের তিন পাড়ে মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটি নামে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সেগুলো ছিল মূলত সরকারি প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।[২]

সরকারের প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠা ছাড়াও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো বিভিন্ন দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত ছিল। বিশেষ করে মুসলিম স্পেন তথা আল আন্দালুস ও সিসিলির আমিরাতে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলোর প্রভাব ছিল সরাসরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হলো ডক্টরেট। ডক্টরেট শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ডকেরে (Docere) থেকে। মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডক্টরেট ডিগ্রির পুরো নাম ছিল লিকেনতিয়া ডকেন্ডি (Licentia Docendi), যার অর্থ হলো শিক্ষা প্রদানের অনুমতি। ল্যাটিন এই ডিগ্রির নাম ছিল মাদ্রাসায় প্রচলিত সর্বোচ্চ ডিগ্রি 'ইজাজত আল তাদরিস'-এর আক্ষরিক অনুবাদ।[৩] ইজাজত মানে অনুমতি, আর দারস মানে শিক্ষা। মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরা ফকিহ, মুফতি ও মুদাররিস–এই তিন টাইটেলের অধিকারী হতেন। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরবর্তীতে এই তিন টাইটেলের সমমর্যাদাসম্পন্ন টাইটেল ম্যাজিস্টার, প্রফেসর ও ডক্টরের আবির্ভাব ঘটে। তবে মাদ্রাসায় ডক্টরেট ডিগ্রি শুধুমাত্র আইন শিক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল। অন্যদিকে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন ছাড়াও শুরুতে স্কলাস্টিক জ্ঞান, যেমন–ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন এবং পরবর্তীতে মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়ার প্রচলন শুরু হয়। তবে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কলাস্টিক ও মানবিক বিদ্যার যে ঐতিহ্য তার সূত্রপাতও ঘটেছিল মূলত ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। এর মধ্যে স্কলাস্টিসিজমের সূত্রপাত যে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায়

তা মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন। অ্যারিস্টটলীয় ও নয়া-প্লেটোনীয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন চর্চার যে ঐতিহ্য ইতালি ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মধ্যযুগে শুরু হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণরূপে মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন চর্চার ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগে মূলত মুসলিম পণ্ডিতরাই অ্যারিস্টটলীয় ও নয়া-প্লেটোনীয় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ধর্মতত্ত্ব চর্চা করতেন, আর ইউরোপে শুরুর দিকের স্কলাস্টিক পণ্ডিতরা মুসলিম দার্শনিক, বিশেষ করে ইবনে রুশদ ও তাঁর অ্যারিস্টটলীয় ভাষ্য পাঠ করার মাধ্যমে স্কলাস্টিক খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব চর্চার শুরু করেছিলেন। রুশদ ছাড়াও আল ফারাবি, ইবনে সিনা ও গাজালির লেখা এই সময় ইউরোপে ব্যাপকভাবে অনুবাদ করা হয়।

আগেই বলেছি, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আকাশ থেকে নাজিল হয়নি, এর একটা ইতিহাস আছে। এবং এই ইতিহাস আলোচনা ছাড়া আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অর্থোডক্স সুন্নি ইসলামের আবির্ভাবের ইতিহাস আলোচনা করারও দরকার হয়ে পড়ে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের সবচেয়ে পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা নয়, এবং ক্লাসিক্যাল মুসলিম দুনিয়ার একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল না। শুরুর দিকের ইসলামি শিক্ষা ছিল মসজিদনির্ভর মজলিশগুলো। পরবর্তীতে বড় মসজিদ, যেগুলো 'জামি' নামে পরিচিত ছিল, সেখানে বিভিন্ন বিভাগকেন্দ্রিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বলে রাখা ভালো যে আগের কালে জামি বলে পরিচিত মসজিদগুলোর বিশেষ সরকারি গুরুত্ব ছিল। শুক্রবারের জুমার নামাজ শুধুমাত্র জামি মসজিদগুলোতেই পড়ানো হতো। এখন বাংলাদেশে যদিও 'জামে মসজিদ' বলতে আলাদা কোনো ধরনের মসজিদ বোঝানো হয় না, কিন্তু আগের কালে এমন ছিল না। জামে মসজিদের সংখ্যা ছিল সব সময়ই কম, এবং এই মসজিদগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। কারণ এই মসজিদগুলোতেই জুমার নামাজ পড়ানো হতো, এবং খতিবরা সেখানে খুতবা পাঠ করতেন। খুতবার সময় খলিফা বা সরকারের নাম নেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। একটা অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের বৈধতার প্রধান দুই শর্ত ছিল–সিক্কা ও খুতবা; অর্থাৎ শাসকের নামে মুদ্রা প্রচলিত হতো এবং জামে মসজিদে খুতবা পাঠ হতো। খুতবা পাঠক তথা খতিব ছিলেন সরকার নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা। জামে মসজিদের সংখ্যা সব সময়ই অত্যন্ত কম ছিল, যেমন এগারো শতকে বাগদাদে মাত্র ছয়টি জামে মসজিদের অস্তিত্ব ছিল, যদিও মসজিদের সংখ্যা ছিল কয়েক শ। আব্বাসীয় আমলে জামে মসজিদগুলোতে পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন হালকা বা বিভাগের অস্তিত্ব ছিল, অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়, যেমন–শুধুমাত্র হাদিসশাস্ত্রের শিক্ষা দেয়া হতো না। একেক হালকায় একেক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। কোনো হালকায় হাদিসশাস্ত্র, কোনো হালকায় ব্যাকরন আবার কোনো হালকায় দর্শন ইত্যাদির শিক্ষা দেয়া হতো।[৪] তবে দর্শন ও বিজ্ঞানের উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্রধান জায়গা ছিল লাইব্রেরি ও হাসপাতালগুলো। আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে বহু লাইব্রেরি ও হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল, যা দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়ার স্বর্ণযুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

> প্রথম সুসংগঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি যেমন 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' এবং এর পূর্বে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলোর ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায় যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সরকারি কর্মচারী তৈরি করা; রাজ্য শাসন ও পরিচালনার জন্য দরকারি শ্রমশক্তি তৈরি করা।

মোটামুটি মাদ্রাসা বলে পরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটেছিল নয় শতকে। মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ডক্টরেট ডিগ্রির আবির্ভাবও নয় শতকেই, এবং এই ডিগ্রির আবির্ভাব ছিল সুন্নি ইসলামের অর্থোডক্সি নির্ধারণ করার জন্য উলামাদের প্রচেষ্টার ফলাফল। নয় শতকে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন রাজনৈতিকভাবে ও মুতাজিলা ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ইসলামের অর্থোডক্সি নির্মাণের যে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়াতেই ইসলামি ডক্টরেট ডিগ্রির আবির্ভাব ঘটেছিল। এর আগে ইসলাম তো বটেই, দুনিয়ায় আর কোথাও এই ধরনের ডিগ্রির অস্তিত্ব ছিল না।[৫] খলিফা মামুনের মিনহা ব্যবস্থা এবং জোর করে উলামাদেরকে 'কোরআনের সৃষ্টতা' বিষয়ক তত্ত্ব মেনে নিতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা ও তার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামের অর্থোডক্সির ক্ষেত্রে উলামা সমাজের উত্থান বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি, এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। নয় শতকের পূর্বে ইসলাম, বিশেষ করে সুন্নি ইসলামের অর্থোডক্সি নির্ধারণের কোনো সহজ উপায় ছিল না। কারণ ইসলামে তো খ্রিস্টধর্মের মতো চার্চ নেই, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্থোডক্স মতামত নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য খ্রিস্টধর্মের মতো সিনোদ নেই। উমাইয়া খেলাফত এবং আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত খলিফাদের এক ধরনের অথোরিটি ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। কিন্তু নয় শতক থেকে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ তথা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব ঘটল সুন্নি ইসলামের সর্বোচ্চ অথোরিটি হিসেবে। তবে তার পরও একাট্টা কোনো অর্থোডক্সি সুন্নি ইসলামে গড়ে ওঠেনি, যা হয়েছে তা হলো সুন্নি বলে পরিচিত আইনি মাজহাবের সংখ্যা কমে গেছে ক্রমান্বয়ে। নয় শতকের পূর্বে সুন্নিদের মধ্যে পাঁচ শর অধিক মাজহাবের অস্তিত্ব ছিল। বারো শতকে মিসরের আইয়ুবি সুলতানরা চারটি মাত্র মাজহাবকে স্বীকৃতি প্রদান করে সুন্নি অর্থোডক্সির একটা সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। এখনও তারই ধারাবাহিকতা জারি আছে। বলে রাখা ভালো যে এখন মাজহাব শব্দটি বলতে আমরা ধর্মীয় সেক্ট বুঝে থাকলেও আদিতে মাজহাব বলতে বোঝানো হতো আইনের ঘরানা (school of law)। ট্র্যাডিশনাল সুন্নি ইসলামে এই কারণে আওয়াম তথা আমজনতার কোনো মাজহাব আছে বলে ধরা হতো না, মাজহাব বিষয়টা ছিল খাস অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত শ্রেণির বিষয়, যার মধ্যে শাসকশ্রেণি ও আলেম-উলামারা আছেন। আমজনতার মাজহাব তাদের শাসকশ্রেণির মাজহাব দ্বারা নির্ধারিত হতো।

খ্রিস্টধর্ম ও শিয়া ইসলামের সাথে সুন্নি ইসলামের অর্থোডক্সির প্রধান পার্থক্য হলো এর অন্তর্গত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। সুন্নি ইসলামে খ্রিস্টধর্মের মতো পোপ নেই, নেই শিয়া ইসলামের মতো ইমাম। মধ্যযুগে সুন্নি ইসলামের অর্থোডক্সি নির্ধারণ হতো আলেম-উলামাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামতের ওপর ভিত্তি করে। চার্চের মতো কোনো হায়ারার্কি ছিল না। যেসব বিষয়ে উলামাদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যেত, তা-ই অর্থোডক্স বলে বিবেচিত হতো। ইসলামের পরিভাষায় এই ঐকমত্যের নাম 'ফতোয়া-ইজমা' (opinion-consensus)। মাদ্রাসায় আইন ও ধর্মতত্ত্বের অর্থোডক্সি নির্ধারণের এই পদ্ধতি ইউরোপের ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং মধ্যযুগ থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক অর্থোডক্সি নির্ধারণে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। মধ্যযুগে শিক্ষালয় বলতে যা ছিল তা মূলত ধর্মীয় শিক্ষালয়, এবং তা মুসলিম ও খ্রিস্টান–এ দুই দুনিয়ার জন্যই সত্য।

কিন্তু ইউরোপে ধর্মতত্ত্ব ও আইনের ক্ষেত্রে চার্চের যে প্রাধান্য ছিল, প্রথমবারের মতো তাকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এই ক্ষেত্রে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুসলিম দুনিয়ার মাদ্রাসার অনুকরণ করেছিল বলা যায়। এও বলা যায় যে ইসলাম ধর্মের অর্থোডক্সি নির্ধারণের পদ্ধতিই মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্যে স্কলারলি অর্থোডক্সি নির্ধারণের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৬] অবশ্য পরবর্তীতে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, সেখানে মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে শুধুমাত্র আইন বিষয়ক মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।

বারো শতকের পূর্বে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় ডক্টরেট সমমর্যাদার ডিগ্রির জন্য একজন আলেমকে ইজতিহাদে পারদর্শী হতে হতো। অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ নতুন মতামত হাজির করতে হতো এবং তা ডিফেন্ড করতে হতো। কিন্তু বারো শতক থেকে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব নাই হয়ে গেল। তখন থেকে মুসলিম পণ্ডিতরা মূলত তাকলিদ অনুসরণ করে আসছেন, অর্থাৎ পূর্বের মুজতাহিদদের মতামত মুখস্থ করে তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। বারো শতকের পূর্বে কেউ তাকলিদ অনুসরণ করলে তাকে পণ্ডিত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো না, ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে অথোরিটি গণ্য করা হতো না। বারো শতকের পর থেকে করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যে 'দারস-এ-হাদিস' ডিগ্রিকে মাস্টার্সের সমমান মর্যাদা দিল, সেটা বারো শতকের পূর্বেকার মুসলিম দুনিয়ায় সম্ভব ছিল না। এখন যেহেতু বাংলাদেশে মুখস্থ বিদ্যা নির্ভর মাস্টার্স ডিগ্রির অস্তিত্ব আছে, সেহেতু হাদিস মুখস্থ করেই মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই দেখা উচিত। বারো শতকে ইসলামি বিদ্যা শিক্ষায় এই স্থবিরতা তৈরি হওয়ার পেছনে কয়েক শ বছরের ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভূমিকা রেখেছে। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের আমলে রাজ অনুগ্রহ থেকে মুতাজিলাদের পতন এবং হাদিস মুখস্থ বিদ্যাকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচারক উলামাদের উত্থান এর পেছনে অন্যতম কারণ। নয় শতক থেকে ক্রমান্বয়ে হাদিসশাস্ত্রের ক্যানোনাইজেশনও অন্যতম প্রধান কারণ, যার ফলে আইনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা হাজির করার সুযোগ কমে গিয়েছিল। সেলজুক আর আইয়ুবি সালতানাতের আমলে ক্রুসেডার ও মোঙ্গলদের হামলা ও তার বিপরীতে রাজনৈতিক বৈধতার জন্য সুলতানদের রক্ষনশীল উলামা সমাজের ওপর নির্ভরশীলতা এবং একপর্যায়ে সুন্নি ইসলামের গণ্ডি বেঁধে দেয়ার যে চেষ্টা তা ইসলামি বিদ্যা শিক্ষাকে স্থবির করে দিয়েছিল। এই স্থবিরতা থেকে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা আজও বের হতে পারেনি। অনেকে বলে থাকেন এই স্থবিরতা চৌদ্দ শ বছরের পুরনো। যাঁরা এমন বলেন তাঁদের ইতিহাস জ্ঞান নেই। এই স্থবিরতার বয়স নয় শ বছরের বেশি নয়।

বারো শতকের পূর্বে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় ডক্টরেট সমমর্যাদার ডিগ্রির জন্য একজন আলেমকে ইজতিহাদে পারদর্শী হতে হতো। অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ নতুন মতামত হাজির করতে হতো এবং তা ডিফেন্ড করতে হতো। কিন্তু বারো শতক থেকে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব নাই হয়ে গেল। তখন থেকে মুসলিম পণ্ডিতরা মূলত তাকলিদ অনুসরণ করে আসছেন, অর্থাৎ পূর্বের মুজতাহিদদের মতামত মুখস্থ করে তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

১১ শতকের অস্থির সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন আল-গাজ্জালি, মৃত্যুবরণ করেছেন বারো শতকের শুরুর ভাগের আরো বেশি অস্থির সময়ে। তাঁর সময়ে আব্বাসীয় খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, সেলজুক সুলতানরা তাঁদের নামে শাসন করতেন। এসময় এক দিক থেকে ক্রুসেডারদের হামলা এবং আরেক দিকে মুসলিম দুনিয়ায় উগ্রবাদী ও জঙ্গিবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উত্থান এবং মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সুলতানদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে একদিকে সুন্নি ইসলাম রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আটকে পড়েছে, অপরদিকে জনপ্রিয় হয়েছে দুনিয়া ও রাজনীতিবিমুখ সুফিবাদ। আল-গাজালি শুরুতে এই সুন্নি রক্ষণশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পরে তাঁর বেড়াজাল থেকে বের হতে গিয়ে সুফিবাদী দুনিয়াবিমুখতা বেছে নিয়েছেন। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা। গাজ্জালির সমসাময়িক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম কাজ করতেন সেলজুক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলা মানমন্দিরে। নিজাম আল মুলকের মৃত্যুর পর তিনিও অভিভাবকহীন হন। রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে এসময় দার্শনিকদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের আন্দোলন ও ইনকুইজিশন জোরদার হয়। এই ধরনের ইনকুইজিশন থেকে বাঁচতে ওমর খৈয়াম বাধ্য হয়ে হজ করতে গিয়েছিলেন। শেষ জীবনে একা একাই অল্প কিছু ছাত্রকে ইবনে সিনা, আল ফারাবি পড়িয়েছেন। দর্শন চর্চার ঐতিহ্যকে হত্যা করতে আল-গাজ্জালিও ভূমিকা রেখেছেন। দার্শনিকদের ইসলামবিরোধী মতামতের বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত বই 'তাহাফুত আল ফালাসিফা' বা 'দার্শনিকদের খণ্ডন' তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম দুনিয়ায় দর্শনবিরোধী অন্যতম প্রভাবশালী বইয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু গাজ্জালি নিজেও দার্শনিক ছিলেন। তিনি যুক্তির ব্যবহার করেই যুক্তি বা আকলের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছিলেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সিনা, ফারাবির ট্র্যাডিশন অনুযায়ী গাজ্জালিও আকলনির্ভর প্রজ্ঞার (হিকমত) ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রজ্ঞারও উর্ধ্বে তিনি খোদ আলাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সজ্ঞাকে আরো উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। সমস্যা হলো তাঁর পরবর্তী যুগে তাঁর যুক্তি ও দার্শনিক মতবাদবিরোধী লেখালেখি ব্যবহার করে অযৌক্তিক ও বেয়াক্কেল কট্টরপন্থীরা দর্শন চর্চাকে মুসলিম শিক্ষাঙ্গন থেকে প্রায় বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিল। ফলে একদিকে যেখানে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইজতিহাদ চর্চার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় চার্চের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে বিকশিত হয়েছে, সেখানে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক উলামা সমাজ পরিণত হয়েছে মুসলিম দুনিয়ার চার্চে।

গাজ্জালি কী কারণে নিজামিয়া মাদ্রাসার আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণে অপাগরতা জানিয়েছিলেন এবার সেই প্রসঙ্গে ফেরত যাই। দায়িত্ব না নেয়ার পেছনে কারণ ব্যাখ্যা করে মুহাম্মদ ইবনে ফখর আল মুলকের কাছে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে অপারগতার যেসব কারণ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল রাষ্ট্রীয় বেতন গ্রহণে অপারগতা। চিঠিতে গাজ্জালি লিখেছেন যে হেবরনে নবী ইব্রাহিমের মাজার জিয়ারত করার সময় তিনি সুলতানের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ না করা তথা রাজকীয় সুবিধা না নেয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন।[৭] আগেই বলেছি, এই ঘটনা তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর পূর্বের। অর্থাৎ এই সময়ে গাজ্জালি তাঁর চিন্তার বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অপারগতা প্রকাশ এবং উজিরের উদ্দেশে কিছু রাজনৈতিক উপদেশ সংবলিত এই চিঠিটি বিভিন্ন কারণে আমাদের সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক

একটি দলিল। চিঠিতে উজিরের উদ্দেশে তাঁর রাজনৈতিক উপদেশের প্রধান অংশই হচ্ছে তিন স্তরবিশিষ্ট সমাজের ধারণা। এই তিন স্তর হলো আওয়াম বা আম (জনতা), খাওয়াস বা খাস (নির্বাচিত) এবং খাস আল খাওয়াস (নির্বাচিতের নির্বাচিত)। তিন স্তরবিশিষ্ট সমাজ বা নগরের যে ধারণা মুসলিম চিন্তায় দেখা যায় তা মূলত প্লেটোর রিপাবলিকের তিন স্তরবিশিষ্ট কল্যাণ রাষ্ট্রের মডেল থেকে নেয়া। গাজালির ভাষায়, কে কোন স্তরের মানুষ তা তার কেবলা দ্বারা নির্ধারিত হয়।[৮] আম স্তরের মানুষের কেবলা হলো দুনিয়াবি লাভ, খাস স্তরের মানুষের কেবলা বেহেশতি লাভ, আর খাস আল খাওয়াস স্তরের মানুষের (গাজালি নিজেকে এই স্তরের ভাবতেন) কেবলা শুধুমাত্র আল্লাহ। গাজালি লিখেছেন, দুনিয়া আর বেহেশত–এ দুই জায়গাই হলো ক্ষুধা আর যৌন কামনা মেটানোর জায়গা। তিনি যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না, ফলে শেষ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে মাদ্রাসার আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উলেখ্য, গাজালি এই চিঠিতে আম, খাস ও খাস আল খাওয়াস নামক তিন স্তরের যে অর্থ করেছেন তা ঠিক প্লেটোনীয় এবং মুসলিম ঐতিহ্যে প্রচলিত অর্থ নয়, তিনি বরং এই তিন স্তরের এক ধরনের সুফিবাদী ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।

আমার মনে হয়, বাংলাদেশে সম্প্রতি আলামা শফির নেতৃত্বে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার ছাড়াই কওমি মাদ্রাসার দারস-এ-হাদিস ডিগ্রির যে স্বীকৃতি দেয়া হলো তার গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝতে হলে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কেবলা কোন দিকে তা বোঝার দরকার আছে। শেখ হাসিনার কেবলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতেই তিনি কওমি মাদ্রাসার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। আলামা শফির কেবলা খুব সম্ভবত বয়সের কারণে তাঁর পুত্র ও কওমি মাদ্রাসার উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাদের কেবলার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এমনিতেই তিনি আজকাল হেলিকপ্টার ছাড়া ওয়াজ মাহফিল করতে যেতে পারেন না। আর তাঁর পুত্রের কেবলা হলো অর্থ-সম্পদ, এবং সেই উদ্দেশ্যেই হেফাজতে ইসলাম ও কওমি মাদ্রাসার সাথে সরকারের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি ২০১৩ সালের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যুক্ত একটা বড় অংশই সরকারি স্বীকৃতি চান দুনিয়াবি শ্রমশক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য। ফলে এখনই না হলেও ধীরে ধীরে হয়তো কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার আরো কাছাকাছি আসবে। কওমি মাদ্রাসা ও হেফাজতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য, তাঁদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ থেকে উচ্চতর দুনিয়াবি ক্ষমতা। কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামিস্টরা এখন আর খালি দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবিই করেন না, সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতার প্রতিনিধিত্বের দাবিও করেন। যদিও ঐতিহাসিকভাবে আমজনতাকে তারা প্লেটোর মতোই ক্ষুধা-কামনায় নিমজ্জিত পশুর কাছাকাছি স্তরের মানুষ বলে বিবেচনা করে এসেছে, কিন্তু এখন তারা সেই প্রবৃত্তির দাস আবেগী আমজনতার ধর্মীয় অনুভূতির প্রতিনিধিত্বের দাবিও করে থাকেন। কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক উলামা সমাজ এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল বাংলাদেশের ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছে, তাতে নিও-লিবারাল অর্থনীতিকেই প্রধান কেবলা করা ছাড়া তাদের কাছে ভিন্ন কোনো পথ খোলা নেই। সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ক আগেও তাদের ইমান-আমলের স্বরূপ নির্ধারণ করেছে। এখন আরো বেশি করবে। বলা যায়, বর্তমান দুনিয়ার নিও-লিবারাল অর্থনীতির স্বার্থই এখন থেকে নির্ধারণ করবে কওমি মাদ্রাসার ইমানের ইন্টারপ্রিটেশন, আর আমলের হায়ারার্কি। ফলে কওমি মাদ্রাসার যে অংশটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইমান-আমল নষ্ট হওয়ার ভয় করছে, তারা হয়তো অচিরেই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রফেশনাল তৈরির পুরনো অবস্থানে ফেরত যাচ্ছে–এই ভেবে তারা সান্ত্বনাও পেতে পারে। কিন্তু এতেও যারা সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে না, তাদের অবশ্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। ইসলামি বিদ্যা শিক্ষার ইতিহাস, দর্শন ও গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাদের ভাবতে হবে। এই ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও তরুণ একাডেমিকদেরই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। ইজতিহাদ প্রয়োগের নামে একদিকে সালাফিবাদ ও অপরদিকে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিতা তাদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, নয় শ বছর পুরনো স্থবিরতা টিকিয়ে রেখে সেই চাপের মোকাবেলা তারা করতে পারবে না। জনতার অনুভূতি রক্ষার নামে পুঁজিবাদী দুনিয়ার স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে তারা কাজ করবে, নাকি গণমানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার এবং দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে শিক্ষার সংস্কারের কাজ করবে–সেই সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হবে। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার ভেতর থেকে ইজতেহাদভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা বিকাশ লাভ করে ভবিষ্যতে উলামা সমাজ নামক চার্চকে ভেঙে দিতে পারবে, নাকি কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের চেয়েও বেশি ক্ষমতার রাজনীতির ঘুঁটিতে পরিণত হবে, তা সময়ই বলে দেবে। কওমি মাদ্রাসার তরুণ ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর এখন ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তারা পালন করতে পারবে কি?

পারভেজ আলম: প্রাবন্ধিক, গবেষক।
ইমেইল: parvez.alam@thehaguepeace.org

তথ্যসূত্র

১) Jonathan AC Brown.(2006). The Last Days of al-Ghazzāl and the Tripartite Division of the Sufi World. Abū☒āmid al-Ghazzāl's Letter to the Seljuq Vizier and Commentary. The Muslim World, Volume 96, Issue 1.

২) Darleen Pryds.(2000). Studia as Royal Offices: Mediterranean Universities of Medieval Europe. Universities and Schooling in Medieval Society. Eds. William James Courtenay, Jürgen Miethke, David B. Priest.Brill. pp.95-99.

৩) George Makdisi.(1989). Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian West. Journal of the American Oriental Society, Vol. 109, No. 2.P.175.

৪) George Makdisi.(1981).The Rise of Colleges. Instituions of Learning in Islam and The West.Edinburg University Press. pp.10-14.

৫) George Makdisi.(1989). Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian West. Journal of the American Oriental Society, Vol. 109, No. 2.P.176.

৬) Ibid.p.177.

৭) Jonathan AC Brown.(2006). The Last Days of al-Ghazzāl and the Tripartite Division of the Sufi World. Abū☒āmid al-Ghazzāl's Letter to the Seljuq Vizier and Commentary. The Muslim World, Volume 96, Issue 1.p.95.

৮) Ibid.p.92.